ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রত্যাশা লোক বিজ্ঞান সংস্থা,
পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু -
৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স
এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮,
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-
৯৩৩২৮৩৩৪৬

বিজ্ঞান অন্বেষক

ভিতরের পাতায়
১) ভূমিকম্প ও তার থেকে বাঁচতে করণীয়, ২) ইনডোর পলিউশন, ৩) খোল-ভারতীয় বুনো কুকুর, ৪) মরিচা বিল, ৫) ছাত্র-ছাত্রীদের কলম।

বর্ষ-১২ সংখ্যা - ৩ মে-জুন/২০১৫ RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

চড়াই কেন ডাকে না

এক সময় ওদের অনেক দেখা যেত। বাড়ি উঠোনে ঘুরে বেড়াত, খুটে খুটে খাবার খেত, আর কিচির মিচির শব্দে একে অপরকে ডাকত। হ্যাঁ, আমি চড়াই পাখির কথা বলছি। লক্ষ্য করেছেন কি এই ছোট্ট পাখিটাকে এখন আর তেমন দেখা যায় না - বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। কলকাতা শহরে এক সময় প্রচুর 'হাড়গিলে' পাখি দেখা যেত। এখন আর তারা নেই। হারিয়ে গেছে। ছোট্ট চড়াইয়েরও কি একই দশা হতে চলেছে? এরাও কি বিলুপ্তির পথে? ভবিষ্যতে কি এরা শুধু বইয়ের ছবি হয়ে থাকবে, অথবা যেতে হবে কোনো মিউজিয়ামে?

ছবিঃ সম্রাট সরকার
চড়াই - House Sparrow
(Passer domesticus)

শুধু চড়াই নয়, সারা পৃথিবীতে অন্যান্য অনেক পাখির সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। নানা দেশের গণনা থেকে জানা গেছে যে, গত ১২ বছরে

এরপর 3 পাতায়

সমুদ্রে প্লাস্টিকবর্জ্য

"আমরা হয়তো প্রতি বছর এক কোটি পচাত্তর লক্ষ টন করে প্লাস্টিকবর্জ্য সমুদ্রে ফেলছি..." কথাগুলি বলছিলেন জেনা জাম্বিক। আমেরিকার জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইউ জি এ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপিকা। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধেতারা সমুদ্র দূষণে বিপুল পরিমান প্লাস্টিকবর্জ্যের কথা বলেছেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথা মাথায় রেখে বিগত কয়েক দশক থেকেই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি সমুদ্র বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্যভাবে আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে। আর আমরা পাচ্ছি মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো নানা তথ্য। স্থলভাগের মতো পৃথিবীর বিপুল জলরাশি দূষণেও অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে প্লাস্টিক যা বিগত শতাব্দির শেষ কয়েক দশক থেকেই বানিজ্যিকভাবে একরকম মানবসভ্যতার অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে। জীবাণুঅবিয়োজ্য (Nonbiodegrabale) এই পলিমারটি দূষণ পরিমানে ও ক্ষমতায় ইতিমধ্যেই প্রায় সব দূষক পদার্থকেই ছাপিয়ে গেছে।

জাম্বিক ও তার সহ গবেষকগণের গবেষণা অনুযায়ী সমস্ত সাগর-মহাসাগরে ভাসমান প্লাস্টিকবর্জ্যের পরিমান এতটাই যে গোটা পৃথিবীর সমুদ্র সৈকতের প্রতি ফুট দূরত্বের জন্য যদি পাঁচ ব্যাগ ভর্তি প্লাস্টিকের কথা ভাবা হয় তবে যা হবে ততটাই। আর ২০২৫ এর মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাস্টিকের ব্যবহার ও প্লাস্টিকবর্জ্যের পরিমান বৃদ্ধি তো আজকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পাবে। এই গবেষকদল বিশ্বব্যাঙ্ক এর তথ্য অনুযায়ী ১৯২টি দেশের সমুদ্রে বর্জ্যনিক্ষেপনের হিসেব থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে তারা কেবলমাত্র সমুদ্র থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাত্রা নিয়ে কাজ করেছেন। কারণ তাদের মতে সমুদ্রবর্জ্য নিক্ষেপণে এরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা নিঃসন্দেহে আরো ভয়াবহ।

এরপর 2 পাতায়

নিষিদ্ধ ওষুধ

ভারতবর্ষের ওষুধ বাজার

ভারতবর্ষের ওষুধ বাজারে এক লক্ষের উপর ওষুধ ফরমুলেশন রয়েছে। এই ফরমুলেশনগুলির ৮০ শতাংশের উপর অপ্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় ফরমুলেশনগুলি ছাড়াই নিরাপদে দুনিয়ার মানুষের চিকিৎসা করা যায়। এই অপ্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকাতে রয়েছে অনেক অকেজো ওষুধ, অবৈজ্ঞানিক মিশ্রণ এবং নিষিদ্ধ ওষুধ।

ওষুধ ফরমুলেশন কি?

কোন রাসায়নিক পদার্থকে আধুনিক ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে ওষুধটির বড়ি, সিরাপ, ক্যাপসুল, ইঞ্জেকশন, মলম, ফোঁটা ইত্যাদি আকারে নিয়ে আসতে হয়। এখানে ওষুধ রাসায়নিক একটি কিন্তু তার ফরমুলেশন পাঁচ / ছয় রকমের। এই ফরমুলেশনগুলি আবার বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে বিক্রি করে। ফলে ওষুধ একটি হলেও তার ফরমুলেশন গিয়ে দাঁড়ায় শতাধিক। আবার কখনো কখনো একটি রাসায়নিকের সাথে একাধিক ওষুধ মিশিয়েও যৌথ ফরমুলেশন তৈরি করা হয়। সাধারণ ভাবে দুটি নীতিকে মাথায় রেখে ওষুধ ফরমুলেশনে বানানো হয়। প্রথমতঃ ওষুধের রাসায়নিক ধর্ম এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারকারীর প্রয়োজন। যেমন বাচ্চাদের বড়ির বদলে সিরাপ দিলে সহজে খেতে পারে। আবার অজ্ঞান

এরপর 4 পাতায়

ছাত্র-ছাত্রীদের কলম

প্লাস্টিক দূষণ ও বিকল্প

(কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম আয়োজিত ৮ম বর্ষ ২০১৫ বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী ঃ প্রশ্নোত্তর পর্বে সেরা উত্তর পর্বটি ছাপানো হল। উত্তরদাতা সৌভিক দাস, নবম শ্রেণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুল, কোচবিহার, তাং ০২/০৫/২০১৫)

১) প্রঃ প্লাস্টিক কি?

উঃ প্লাস্টিক হল একপ্রকার পেট্রোলিয়াম নির্ভর পদার্থ যেগুলি অ-পুণর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ থেকে আসে। আমাদের নিত্য দিনের এই প্লাস্টিক তৈরি করতে শতকরা ৪ শতাংশ তেল খরচ হয়।

২) প্রঃ কি পদ্ধতিতে প্লাস্টিক তৈরি হয়?

উঃ যেভাবে প্লাস্টিক তৈরি করা হয় তা নীচে বর্ণনা করা হল —

প্লাস্টিক তৈরি হয় পলিমারাইজেশন পদ্ধতিতে হাইড্রোকার্বন উত্তপ্ত করার ফলে। অণুঘটকের উপস্থিতিতে বড় বড় অণুগুলোকে পরিণত করা হয়। এরপর ইথিলিন, প্রোপাইলিন, বিউটেন ও টাইরেন প্রভৃতি মনোমারগুলি রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চেইন আকারে তৈরি করে পলিমার (এর মূল উপাদান 'কার্বন' ও 'হাইড্রোজেন')। এভাবে আমাদের নিত্যদিনের প্লাস্টিক তৈরি হয়।

৩) প্রঃ *২টি মনোমার ও ২টি পলিমারের নাম লেখ?*

উঃ ২টি মনোমারের নাম হল - ক) ইথিলিন ও খ) বিউটেন।

২টি পলিমরের নাম হল - ক) পলিভিনাইল কোরাইড ও খ) নাইলন।

৪) প্রঃ *প্লাস্টিকের ৪টি ক্ষতিকারক দিক লেখ?*

উঃ ১) ক্যান্সার এর মতো রোগ ঘটাতে পারে (পলিইথিলিন থেকে)।

২) বৃক্কের সমস্যা, চোখ, নাক, গলা প্রভৃতির সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে (পলিস্টাইরিন থেকে)।

৩) শিশুদের বৃদ্ধি, ব্যবহার মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় (পলিকার্বোনেট থেকে)।

৪) ফুসফুস, রক্ত সংবহন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর কাজ করে (পলিইউরোথেন থেকে)।

৫) প্রঃ *তোমার এলাকায় প্লাস্টিক কি কি ক্ষতি করছে?*

উঃ আমার এলাকায় প্লাস্টিক কি কি ক্ষতি করছে সেগুলি হল -

১) গ্রামের অনেক মানুষের ক্যান্সার এর মতো দুরারোগ্য রোগ ঘটেছে।

২) অনেক মানুষের বৃক্কের সমস্যা, চোখ, কান, নাক, গলা প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

৩) গ্রামের অনেক শিশুদের বৃদ্ধি, ব্যবহার মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছে।

৪) অনেক মানুষের ফুসফুস, রক্তসংবহন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর কাজ করে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

৬) প্রঃ *প্লাস্টিকের যে কোন ২টি বাণিজ্যিক ব্যবহার লেখ?*

উঃ ১) পেপসি কাপ, ডিসপোসেবল ফোমি প্লাস্টিক কাপ, প্লাস্টিকের টায়ার প্লেটস, থার্মোকল, কম্পিউটার, টেলিভিশন প্রভৃতির প্যাকেজিং বাক্স, ক্যাসেট এ ব্যবহৃত হয় প্লাস্টিক (পলিটাইরিন থেকে)।

২) চিরুনি, আল চিপস, চানাচুর প্রভৃতির প্যাকেট ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহৃত হয় (পলিপ্রোপাইলিন থেকে)।

৭) প্রঃ *প্লাসিটেক বিকল্প হিসেবে তুমি কি কি ব্যবহার করবে?*

উঃ প্লাসিটেক বিকল্প হিসেবে আমি যা যা ব্যবহার করব তা হল -

১) প্লাস্টিকের পরিবর্তে আমি এবং আশেপাশের আত্মীয়স্বজনের চেষ্টায় কাগজের ব্যাগ, কাগজের থলে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেব।

২) কাপড়ের ব্যাগ, থার্মোকলের ব্যাগ প্রভৃতির ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ আমি করব। এছাড়া চিনা মাটির কাপ ব্যবহার করতে বলব সবাইকে। প্লাস্টিকের ব্যবহার তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেব। এর সাথে সাথে আমি স্লোগান দেব 'Three R অর্থাৎ Reduce, Re-use এবং Recycle প্লাস্টিক'। প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে এই আমার চেষ্টা হবে।

সমুদ্রে প্লাস্টিকবর্জ্য

1 পাতার পর

সাগরজলে প্লাস্টিকের এই বাড়বাড়ন্তে একদিকে যেমন ওখানকার বাস্তুতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি মানুষও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমুদ্রজাত খাবারের উপর নির্ভরশীল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে কোনো না কোনো ভাবে এই প্লাস্টিক প্রবেশ করে। অনেক ক্ষেত্রেই প্লাস্টিকের নানা রকম যোজনীয় পদার্থ থাকে যেগুলি বিষাক্ত এবং পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল জাতীয় যৌগকে গ্রহণ করে রাসায়নিক স্পঞ্জ হিসাবে শরীরে থেকে যেতে পারে।

বিশ্বের প্রথম ২০টি প্লাস্টিক উৎপাদনকারি দেশের মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র বাদে চিন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, ভারত সহ সব দেশেরই বর্হিগামী বাণিজ্যের সাথে প্যাকেজিং এর নানা ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বিকল্প আপাতত নেই। অর্থাৎ প্লাস্টিকহীন সভ্যতা এখন কল্পনাতীত। এই অবস্থায় তাই প্রয়োজন ব্যবহৃত প্লাস্টিকের আবশ্যিক পুনর্নবীকরণ। যদিও ২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন প্লাস্টিক প্রস্তুতকারক সংস্থার সদস্যরা প্লাস্টিক দূষণের হার কমানোর উদ্দেশ্যে 'ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পুনর্নবীকরণ ও পুনর্ব্যবহার' অভ্যাস করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিখ্যাত সমুদ্রদূষণ বিশেষজ্ঞ এরিকসন এর মতে আসলে আমাদের প্লাস্টিক ব্যবহারের ধরণটাই বদলে ফেলা উচিৎ। ব্যবহৃত প্লাস্টিক এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে প্রায় সবটাই পুনর্নবীকরণ যোগ্য হয়। তাছাড়া বর্জ্য যদি দামি এবং পুনর্নবীকরণ যোগ্য হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই তা যথেচ্ছভাবে সমুদ্রের জলে ফেলা বন্ধ হবে। প্লাস্টিক দূষণ রোধে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি কেবলমাত্র বর্জ্যপদার্থের সঠিক ব্যবস্থাপনায় প্রচুর অর্থ বরাদ্দ না করে যদি নতুন ধরণের প্লাস্টিক আবিষ্কার, দ্রব্যাদি ও প্যাকেজিং এর ডিজাইনের দিকে যত্নশীল হয় তবে হয়তো ক্রমবর্ধমান প্লাস্টিকবর্জ্যের হাত থেকে ভবিষ্যৎ নিষ্কৃতির কোনো পথের দিশা মানবসভ্যতা খুঁজে পাবে।

লেখক ঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, রসায়ন শিক্ষক, শ্রী রামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুল
E_mail : acnbu13@gmail.com, মোঃ- ৯৪৩৪৩৭৭০৬৭

চড়াই কেন ডাকে না

1 পাতার পর

চড়াইয়ের সংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশ কমে গেছে। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু এদের রক্ষা করার জন্য তেমন কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চড়াই হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী আমাদের বদলে যাওয়া জীবনযাত্রা। ৬০-৭০ বছর আগেও আমাদের সমাজে ফ্ল্যাট বাড়ির কালচার ছিল না বললেই চলে। একতলা অথবা দোতলা বাড়ির সংখ্যাই ছিল বেশি। মাঝে মধ্যে দু-একটা তিন-চারতলা বাড়ির দেখা পাওয়া যেত। কলকাতা শহরে এখন এত জন সমাগম ছিল না। রাস্তার তীব্র আলোর ঝলকানি ছিল না। গছপালাও ছিল বেশি। শহরে যত ভিড় বাড়তে লাগল বাসস্থানের চাহিদাও বাড়তে থাকল। গাছপালা কাটা শুরু হল, জলাভূমি ভরাট হতে লাগল, পুরানো একতলা দোতলা বাড়িগুলি ভেঙে তৈরি হতে লাগল ফ্ল্যাট বাড়ি। একই বাড়িতে অনেক পরিবারের বাস। অফিস কাছারি পুরানো বাড়িগুলি ভেঙ্গে সেখানে তৈরি হল আকাশচুম্বী বাড়ি। এখন প্রশ্ন হতে পারে বাড়ির সঙ্গে চড়াই পাখির সম্পর্ক কি? আগেকার দিনের বড়ি আর একনকার বহুতল বাড়িগুলির মধ্যে নির্মাণ শিল্পে অনেক পার্থক্য আছে। পুরানো বাড়িগুলিতে থাকা নানা ধরণের ছোট বড় ফাঁক-ফোকর, খুলখুলি, কড়ি-বড়গা, চিলে ঘর, জিনিসপত্র রাখার জন্য দেওয়ালের গায়ে তৈরি করা হত উঁচু তাক ইত্যাদি। এগুলি চড়াই পাখির বাসা বানানোর জায়গা। সেখানে এরা ডিম পাড়ত, ছানা বড় হত। তারপর একদিন উড়ে যেত। এই দৃশ্য দেখা যেত প্রতি বছর এদের প্রজননের সময়। মানুষও এদের তেমন বিরক্ত করত না। এখনকার বাড়িগুলি এভাবে তৈরি হয় না। কড়ি-বড়গার পরিবর্তে এখন বাড়ি তৈরি হয় ঢালাই পদ্ধতিতে। দেওয়ালগুলি হয় মসৃণ। ফলে কোনো ফাঁক-ফোকর থাকে না। ঘুলঘুলি রাখার কথা তো স্থপতিরা ভুলেই গেছে। তাই মানুষের বাসস্থান বাড়লেও চড়াইদের বাসা বানানোর জায়গা কমে যাচ্ছে। বাসাই যদি বানানো না যায় তাহলে ডিম পাড়বে কোথায়?

শুধু বাসা বানানোর জায়গা যে দিন দিন কমে যাচ্ছে তা নয়, খাবারেও টান পড়ছে। ছানাদের প্রধান খাদ্য পোকা। তখন তাদের বেড়ে ওঠার সময়। তাই প্রোটিনের প্রয়োজন। চড়াই দম্পতি সারা দিন খুটে খুটে নানা জিনিস খেলেও ছানাদের খাওয়ানোর জন্য ধরে নিয়ে আসে পোকা। কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পোকা তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে খাদ্য সঙ্কটে ভুগছে চড়াই পাখিরা।

তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে বলে রাস্তার ধারেই হোক বা বাগান তৈরিতেই হোক দেশি গাছের বদলে বিদেশি গাছের কদর বাড়ছে। এইসব বাহারি গাছে পোকাও ধরে কম। পোকা মাকড়ের সংখ্যা কমে যাওয়ার পরাগ মিলনে ব্যাঘাত ঘটছে। গাছে ফলন কমছে। খাদ্য সঙ্কটের এটাও আরেকটা কারণ।

শোনা যাচ্ছে মোবাইল ফোনের মূল তরঙ্গ নাকি চড়াই পাখিদের অস্তিত্ব সঙ্কটের অন্যতম কারণ। এই তরঙ্গ হাজার হাজার চড়াইকে নিঃশব্দে হত্যা করছে। বিশেষজ্ঞদের এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে যে হারে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেড়ে চলেছে তাতে এই নিরীহ ছোট্ট পাখিটির বিলুপ্তি বেশি দূরে নয়। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যাব একটি স্লোগান— 'একদা চড়াই নামে একটা পাখি ছিল, চল তাকে দেখে আসি মিউজিয়ামে।'

তাহলে সত্যিই কি চড়াই পাখি হারিয়ে যাবে? পাখি প্রেমী পাখি বিশারদরা তা চান না। চাননি আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পাখি বিশারদ মহম্মদ দিলওয়ার বিগত ৮ বছর ধরে চড়াই রক্ষার কাজে ব্যস্ত আছেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে মার্চ মাসের ২০ তারিখকে চড়াই দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ৪ বছর ধরে এই দিনটি বিশ্বব্যাপী চড়াই পাখি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে — উদ্দেশ্য জনসাধারণকে সচেতন করা।

বেঙ্গালুরুর পাখি বিশারদ দিলওয়ার মত উত্তর ভারতের গাড়োয়াল হিমালয়ের উখমঠের বাসিন্দা পাখি প্রেমি যশপাল সিং নেগি ঠিক করে ফেলেছেন যে তিনি চড়াইদের জন্য একটা বাড়ি বানাবেন। পাথরের তৈরি এই বাড়িতে থাকবে অসংখ্য ফাঁক-ফোকর যেখানে চড়াই পাখিরা নিশ্চিন্তে বাসা বাঁধতে পারবে। বাড়ির নাম হবে 'চড়াই ভবন'। এমন উদ্যোগ ঘরে ঘরে হলে অসহায় পাখিগুলিকে আর করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে না।

লেখক ঃ কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭এ সেন্টাল রোড, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২

সমীক্ষার রিপোর্ট

জলাশয়ের কথা

মরিচা বিল ঃ অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম মরিচা বিল দেখতে যাব। ঠিক আচমকাই এক দুপুরে অনুপ হালদারের সঙ্গে গাড়ীতে মরিচা বিল পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে পড়লাম। বহু তথ্য সংগ্রহের পর আমরা দুজনে মোহনপুর হাটের পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। শুরুতেই সাইকেল মেকানিক রামের কাছ থেকে খুটিনাটি তথ্য জেনে নিলাম। প্রায় ১ কিমি রাস্তা যাওয়ার পরই মরিচা বিলের সন্ধান পেলাম। রাস্তার পাশে নিচু জমি ধান চাষ হচ্ছে। খবর নিয়ে জানলাম মরিচা বিলেই ধান চাষ হচ্ছে। রাস্তায় ছোট একটা কালভার্ট এর কাছে দাঁড়িয়ে রং মিস্ত্রী গৌর সরকারের কাছ থেকে বেশ কিছু তর্থ্য জানতে পেলাম। বিলে অনেক আগে জল থাকত, মাছ চাষ হতো। সব রকম মাছের চাষ হতো। ফলিমাছ, গজাল মাছ ইত্যাদি। কমল শেঠ মাছ চাষের কথা উল্লেখ করেন। কালভার্টের পাশে আর একটি বিলের সন্ধান পাওয়া গেল। এর নাম মেঝে বিল, এখানে ধান চাষ হচ্ছে। এরপর আরো পথ অতিক্রম করে আমরা মরিচা বিলের ধার ধরে শেওড়াগাছি হাটের কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে চললাম। মরিচা বিলে ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষের জন্য বড় বড় পুকুর কাটা হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজের লোক দিয়ে পুকুর কাটা হচ্ছে। মরিচা গ্রাম পঞ্চায়েত, মাঝিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত হরিণঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এর মধ্যে দিয়ে মরিচা বিল প্রায় ৯০ হেক্টর আয়তনের মরিচা, মাসুন্দা এলাকায় বেশ কিছু মহিলার সঙ্গে বসে কথা বলে অনেক তথ্য জানা গেল। অঞ্চল থেকে পাট্টা করে জমি নিয়ে ধান চাষ, মাছ চাষ করা হচ্ছে। ফলে মরিচা বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। জল নিস্কাশনের অসুবিধার কথা গ্রামবাসীরা জানালেন। বহু বড় পুকুর কেটে মাছ চাষ করা হচ্ছে। বাকী অংশে ধান চাষ, আম চাষ কোথাও কোথাও বাড়ী ঘর হয়ে যাচ্ছে। মরিচা বিলের ধার ধরে যাওয়ার পথে আম, কাঠাল, সুপারি, নারকেল সহ বেলগাছ পালা চোখে পড়ল। ভালুকা, মন্ডোরি এলাকার মধ্যে দিয়ে মরিচা বিল মাঠপাড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে। মরিচা বিল মথুরা বিলের সঙ্গে সংযোগ হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশে। এভাবে মরিচা বিলে ধান চাষ মাছ চাষ চলতে থাকলে আগামী প্রজন্ম আর মরিচা বিলের অস্তিত্ব খুঁজেই পাবে না। মরিচা বিল নতুন করে সংস্কার করা হোক। এটাই মরিচা, ভালুকা ও মন্ডোরি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভাবনা।

প্রতিবেদক ঃ জয়দেব দে।

নিষিদ্ধ ওষুধ

- 1 পাতার পর

রোগী বা জরুরী প্রয়োজনে ইঞ্জেকশন দিতে হয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ওষুধের নাম ঃ মেট্রোনিডাজেল (আমাশয়ের ওষুধ)। ফরমুলেশন ঃ বড়ি, সিরাপ (সাসপেনশন) ইঞ্জেকশন, মলম। বাণিজ্যিক নাম ঃ মেট্রোজিল, ২০০ মিগ্রা, ৪০০ মিগ্রা বড়ি। কোম্পানি ঃ ইউনিক কোম্পানি। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির ফরমুলেশন রয়েছে।

অকেজো ওষুধ ঃ— যে সমস্ত ওষুধ ফরমুলেশন আদৌ কোন কাজ করে না কিন্তু ওষুধ কোম্পানি ও তাদের মদত পুষ্ট চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা বলেন যে ওষুধটি কাজ করে। ইচ্ছে মত দুই অন্ধ পদ্ধতির পরীক্ষায় ওষুধ ফরমুলেশনগুলির কার্যকারিতা প্রমাণ হয়নি। উদাহরণ—

লিভার টনিক ঃ- সরবিলিন, ডেলফিকল, সিলিমারিন রয়েছে যেসব ফরমুলেশনে, হেপামার্জ, অরনিলিড।

রক্ত বন্ধের ওষুধ ঃ বট্রোপাস, ডাইসিনন, ক্রোমস্টাট।

প্রদাহরোধী ঃ স্টেরডিন, প্লাসেনটেক্স, সেরাসিওপেপটাইডেস, কাইমোরাল ইত্যাদি।

এবং বিভিন্ন ধরণের টনিক।

অবৈজ্ঞানিক মিশ্রণ ঃ— এক্ষেত্রে এককভাবে রাসায়নিকগুলি ওষুধ হিসাবে কার্যকরী এবং নিরাপদ। কিন্তু একসাথে মিশিয়ে দিলে যৌথ কার্যকারিতা বাড়ে না বা একে অপরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমায় না। তাছাড়া অর্থের গুণাগার রয়েছে।

বেদনানাশক ঃ আমাদের দেশে বেদনানাশকের অবৈজ্ঞানিক মিশ্রণ বলতে কম বেশ হাজার হয়ে যাবে। যেমন- Paracetamol এর সাথে Diclofenac, Ibuprofen, Tramadal ইত্যাদি মেশানো।

আমাশয় ঃ Metronidazole বা Tinidazole - এর সাথে Ciprofloxacin বা Ofloxacin বা Norfloxacin মেশানো।

অম্বল বা গ্যাসে ঃ Domoeridone -এর সাথে Omeprazole বা Pantoprazole, Lansoprazole বা Famotidine মেশানো।

উচ্চরক্ত চাপে ঃ Amlodepine এর সাথে Lisimopril বা Enalapril বা Losartan বা Atenolol মেশানো।

নিষিদ্ধ ওষুধ ঃ— আমরা জানি প্রায় ওষুধেরই কিছু না কিছু খারাপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই বলা হয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ওষুধ হয় না। কখনো কখনো খারাপ প্রভাবকে মানিয়েই ওষুধ প্রয়োগ চলতে থাকে। আবার কখনো কখনো ব্যবহারকারী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলাতে না পারলে ওষুধ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হয়। তথাকথিত উন্নত দেশ ইউরোপ ও আমেরিকায় ওষুধের খারাপ প্রতিক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে সে দেশের সরকার ওষুধগুলিকে নিষিদ্ধ করে, উৎপাদন বন্ধ হয় এবং বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়।

ওষুধ বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিষিদ্ধ ওষুধ ঃ— ওষুধ বিজ্ঞানের ইতিহাস কবে থেকে শুরু এ তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে 'নিষিদ্ধ ওষুধ' এর ঘটনা মাত্র ১০০ বছরের কাহিনী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদিতে 'ওষুধ' বলে কোন নির্দিষ্ট বস্তু ছিল না। সেই সময়ে খবার ও ওষুধ প্রায় সমার্থক ছিল। আসলে কোনটা ওষুধ আর কোনটা খাবার তা বোঝার বা ফারাক করার মানদণ্ড তৈরি হয়নি।

নিষিদ্ধ ওষুধের বিরুদ্ধে আন্দোলন : দেশে-বিদেশে ঃ— আমরা আগেই থ্যালিডোমাইড বিপর্যয়ের কথা আলোচনা করেছি। এই ওষুধটিই দুনিয়াতে প্রথম নিষিদ্ধ হয়। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে আমরা জানতে পারলাম ক্লিওকুইনল Clioquimol আমাশয়ের ওষুধ) ওষুধটি কুকুরদের মৃগীরোগ জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি করে। এমনকি মৃত্যুর খবর এলো। কিন্তু মানুষের উপর ব্যবহার চলতে লাগল। ১৯৬৫ সাল নাগাদ শিশুদের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সুইডেনের ডাঃ ওলি হ্যানসন ৪৫০টি শিশুর স্নায়ুঘটিত সমস্যার কথা বিখ্যাত ল্যানসট (Lancet) পত্রিকায় লিখলেন। এ ঘটনা বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি সিবা-গায়গী মেনে নেয়নি। ১৯৭০ সালে জাপানে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) মানুষের চোখের স্নায়ুঘটিত সমস্যা হলো। যার ডাক্তারি নাম Subacute Myelooptic Neuropathy (SMON)। সিবা গায়গীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা হলো। ১৯৮২ সালে ভারতে হাইড্রোক্সিকুইনোলিনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় (D.O.No.X19013/8/81D dt. 13/8/82)। ১৯৮৫ সালে দুনিয়া থেকে সিবা-গায়গী কিওকুইনল তুলে নিতে বাধ্য হয়। ডাঃ ওলি হ্যানসন মারা যান ১৯৮৫ সালের ২৪ মে।

সারা পৃথিবীতে সিবা-গায়গী মেক্সাফরম (Mexaform) এবং এন্টারো ভায়োফরম (Enterovioform) বাণিজ্যিক নামে ওষুধটি বিক্রি করত। এই ওষুধটির বিকল্প ভাল কার্যকরী ও নিরাপদ ওষুধ হচ্ছে মেট্রোনিডাজোল এবং টিনিডাজোল। ভারতে আজও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল Enterouinol নামে এবং স্টাডমেড কোম্পানি Enterozyme নামে বিক্রি করে। ২৪ মে প্রতি বছর ডাঃ ওলি হ্যানসনকে নিষিদ্ধ ওষুধ বিরোধী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পথিকৃত হিসাবে স্মরণ করা হয়।

১৯৭৬-৮২ সাল নাগদ বেশি মাত্রার ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরণের যৌথ মিশ্রণ (E.P.drugs) ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলেছে। ১৯৭৯ সালে ডাঃ পালানিআপ্পান দেখালেন E.P.Drugs ব্যবহারকারী মায়েদের শতকরা ৩১ ভাগ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিয়েছেন। ১৯৮২ সালে ভারত সরকার E.P.Drugs ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (D.O.No.X19013/8/91D dt. 13/8/82)।

১৯২০ সাল নাগাদ অ্যামাইনোফেনাজোন/অ্যামিডোপাইরিন (Aminophenazone / Amidopyrine) নামে প্রদাহরোধী ও বেদনানাশক ওষুধ বের হয়। ওষুধটি অ্যানালজিন (Analgin) নামেও পরিচিত। সাধারণ মানুষ ব্যারালগন (Baralgon) নামে চেনেন। ১৯২২ সালে হেক্স্ট কোম্পানি (Hoechst) অ্যামিডোপাইরিনের রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন করে (Sodium) বাজারে ব্যারালগন নামে আনে। এই রাসায়নিকটিও মূল রাসায়নিকের মতোই ব্যবহারকারীর রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা কমিয়ে দেয়। ফলে দাবী ওঠে এই গোত্রের ওষুধগুলিকে বাজার থেকে তুলে নিতে হবে। ১৯৬০-৭০ সালে ওষুধটি সুইডেন, নরওয়ে, অস্টেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে নিষিদ্ধ করা হয়। প্রসঙ্গত এই সময়েই অনেক ভালো কার্যকরী ও নিরাপদ বেদনানাশক বাজারে এসে গেছে। যেমন আইবুপ্রফেন, ডাইকোফেনাক ইত্যাদি। ১৯৮২ সালে ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ

এরপর 5 পৃষ্ঠায়

নিষিদ্ধ ওষুধ

4 পাতার পর

সংস্থা অ্যামিডোপাইরিনকে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু জার্মান বহুজাতিক হেক্স্ট কোম্পানি নামের কারসাজি করে Analgin নামে দীর্ঘদিন চালু রেখেছিল। ভারত সরকার আবার অ্যানালজিনকে বাজারে চালু করেছে।

ভারতের ওষুধ বাজারে কয়েকটি নিষিদ্ধ ওষুধ

নীচের ওষুধগুলি সরকার নিষিদ্ধ করেছে; আর ওষুধ কোম্পানীকে বলেছে কায়দা করে চালিয়ে যাও। যেমন-ভিটামিন বি-১, বি-৬, বি-১২ এর মিশ্রণ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এই মিশ্রণের সাথে আরও কিছু মিশিয়ে কোম্পানি বোঝাতে চাইছে — এটাতো নিষিদ্ধ হয়নি।

মেট্রোনিডাজোল ও ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড মিশ্রণ নিষিদ্ধ যে কারণে একই কারণে মেট্রোনিডাজোল বা টিনিডাজোলের সাথে নরফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন বা অফ্লক্সাসিনের মিশ্রন ওষুধটি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

স্টিকনিন (Strychnine) আধুনিক ওষুধ বিজ্ঞানে নিষিদ্ধ কিন্তু এখনো হোমিওপ্যাথি ফরমুলেশনে বহাল তবিয়তে চালু আছে।

Hydroxyquinoline (Clioquinol) নিষিদ্ধ ; কিন্তু কায়দা করে Quinodochlor নামে চলে। উদাহরণঃ Enteroquinol

সাইপ্রোহেপ্টাডিনকে ক্ষিদে বাড়ানোর ওষুধ হিসাবে চালু রাখা হয়েছে।

নিষিদ্ধ ওষুধ বাতিলের রাজনীতিঃ

নিষিদ্ধ ওষুধের উৎপাদন ও বাজারজাত করণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বুঝতে গেলে কতকগুলি প্রশ্নকে আমাদের সামনে আনতে হবে। সেগুলি হোল —

১) ভারতের প্রতিবেশি বাংলাদেশের ওষুধ বাজারে ১৯৮২ সাল থেকে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নেই। বাংলাদেশে কোন নিষিদ্ধ ওষুধ উৎপাদন হয় না। অথচ ভারতবর্ষের ওষুধ বাজারে উলটো চিত্র কেন?

২) ভারতে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ফরমুলেশন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন যাদুমন্ত্রে সেগুলি বাজারে চালু রয়েছে।

৩) নিমেসুলাইড, কুইনোডাকোর জাতীয় ওষুধ বিদেশে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে চলে কেন?

৪) নীতিগত ভাবে ভারত সরকার বা বিভিন্ন রাজ্য সরকার (দিল্লী, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি) অপ্রয়োজনীয় ওষুধের বিষয়টিকে মেনে নিলেও কাজের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি কেন?

৫) ভারতবর্ষে যে সমস্ত ওষুধ ও ওষুধ ফরমুলেশন ভারত সরকার নিষিদ্ধ করেছে তা কি জনগণ ও ওষুধ বিজ্ঞানীদের আন্দোলনের চাপে না সরকারের পরিচালকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফসল হিসাবে?

তাহলে ভারতবর্ষের ওষুধ বাজার কি অপ্রয়োজনীয় নিষিদ্ধ ওষুধে ভরে থাকবে? বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন এর প্রতিকার অসম্ভব। কিন্তু আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

জনগনের মধ্যে আমাদের প্রচার আন্দোলনকে লাগাতার করতে হবে। ভবিষ্যতে সমস্যা সমাধানের উপায় নিশ্চয়ই আমরা বের করতে পারব।

প্রতিবেদক ঃ— (সোসাল ফার্মাকোলজি, ২৬ তম বুলেটিন, ডিসেম্বর ২০১৪)

সাবান কি এবং এর অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। দূষণময় পরিবেশে মানুষ নিজেকে এবং তার ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ আরো সুন্দর এবং আরো পরিষ্কার রাখার জন্য দীর্ঘদিন আগে থেকে সাবানের ব্যবহার করে আসছে। আর এই সাবানের অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষের ক্ষতি করতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই প্রসঙ্গেই এই আলোচ্য বিষয়টি।

সাবান হল উচ্চআনবিক ওজন বিশিষ্ট জৈব ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম অথবা পটাশিয়াম লবন। যেমন সোডিয়াম পামিটেট ($C_{15}H_{31}COONa$), সোডিয়াম স্টিয়াবেট ($C_{17}H_{35}COONa$) ইত্যাদি। সাধারণত সোডিয়াম সাবান জামা কাপড় পরিষ্কারের জন্য ও পটাশিয়াম সাবান গায়ে মাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাবানের দুটি অংশ - একটি হল হাইড্রোকার্বন অংশ যা অধ্রুবীয় তাই জল বিকর্ষী এবং অপরটি আয়নীয় যা জল আকর্ষী। যেমন সোডিয়াম স্টিয়ারেট জলে আয়নিত হয়ে যে স্টিয়ারেট আয়ন ($C_{17}H_{35}COO^-$) ও Na^+ আয়ন দেয় তার মধ্যে স্টিয়ারেট আয়নের হাইড্রোকার্বন অংশ $C_{17}H_{35}$ অংশটি জল বিকর্ষী হলেও COO^- অংশটি জল আকর্ষী। একটি নির্দিষ্ট গাঢ়ত্বের উপরে হাইড্রোকার্বন অংশগুলি জোটবদ্ধ হয়ে গোলকের আকার ধারণ করে কোলয়েডীয় অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপ গোলকের কেন্দ্রে থাকে হাইড্রোকার্বন অংশ এবং পৃষ্ঠতলের দিকে আয়নীয় অংশ। আয়নগুলির এইরূপ গোলকাকার সমবায়কে মিসেল বলে।

সাবানের কার্যপ্রনালী ঃ— সাবানকে জলে দিলে যে কোলয়েডীয় অবস্থার তৈরী হয় তা জামা কাপড়ের গায়ে জমে থাকা তৈল জাতীয় পদার্থ কিংবা ধূলো ময়লাকে জলের সঙ্গে যোগ কর ইমালসন তৈরী করে তেল জাতীয় পদার্থগুলিকে জামা কাপড়ের অংশ থেকে অপসারিত করে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে।

সাবানের অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা ঃ— সাধারণত সাবান ও শ্যাম্পুতে মূল উপাদান ছাড়াও আরো কিছু জৈব ও অজৈব উপাদান মেশানো হয় যা সাবানকে মোলায়েম, সুগন্ধি ও সুদৃশ্য করে তোলে। এছাড়াও অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল উপাদান হিসেবে ট্রাইক্লোস্যান ব্যবহৃত হয় যা কিনা লিভার ক্যানসারের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানীদের মতে দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত সাবান কিংবা শ্যাম্পু ব্যবহার করলে লিভারের বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। সাম্প্রতিককালে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্যান দিয়েগো স্কুল আব মেডিসিনের অধ্যাপক রবার্ট টার্কি ইঁদুরের উপর ট্রাইকোস্যান প্রয়োগ করে প্রমাণ করেছেন কিভাবে লিভারের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লিভার জুড়ে ক্যান্সার টিউমার তৈরী হচ্ছে। তাঁর মতে ট্রাইকোস্যান লিভারের মধ্যে থাকা অ্যাড্রোস্টেন রিসেপটরগুলিকে নষ্ট করে দেয়। এইসব প্রোটিন জাতীয় রিসেপটর গুলির কাজ হল শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকা ক্ষতিকর যৌগগুলিকে নষ্ট করতে সাহায্য করা। আর এই রিসেপটর নষ্ট হতে থাকলে লিভার কোষগুলি অনিয়মিত ভাবে ভাঙ্গতে থাকে এবং কোষগুলি ফাইব্রোসিস টিউমার তৈরী করতে থাকে। তাই মাত্রাতিরিক্ত পরিষ্কারের জন্য বেশি সাবান ব্যবহার করলে ট্রাইকোস্যান শরীরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা বাড়বে এবং মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

— জয়দেব মাইতি, শিক্ষক, রসায়ন বিভাগ, কেউটগেড়িয়া বিদ্যাসাগর হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ- ৯৪৩৪৬৯২৩৬৫

ভারতের প্রাণী বৈচিত্র্য ঃ ধোল্ - ভারতীয় বুনোকুকুর

ভারতীয় উপমহাদেশ প্রাণী বৈচিত্র্যে ভরপুর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতীয় গহন অরণ্যে বুনোকুকুর এর উপস্থিতি বন্য জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। বুনো কুকুর সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র বন্য প্রজাতি যাদের বাঘও ভয় পায়।

সারা পৃথিবীতে বুনো কুকুরের মোট দুটি প্রজাতি বেঁচে আছে এক ধোল্ বা ভারতীয় বুনোকুকুর আর অপরটি হল আফ্রিকার বুনোকুকুর। সর্বসাকুল্যে আফ্রিকার প্রজাতির সংখ্যা ৫০০০ এর মত হলেও ভারতীয় প্রজাতির সংখ্যা অত্যন্ত কম।

ভারতীয় বুনোকুকুরকে হিন্দিতে ধোল্ (সারা ভারতে প্রচলিত নাম), জংলী কুত্তা, গুজরাটিতে কোল-কুত্তা, মালয়াম ও তামিল ভাষায় চেন্-নাই ও কাশ্মীরে রামকুল প্রভৃতি নামেও এদের ডাকা হয়। এদেরকে এশিয়ার লালকুকুরও বলে। গৃহপালিত কুকুর, শেয়াল বা নেকড়ের সাথে এরাও Canidae পরিবরের সদস্য। তবে নীচের চোয়ালে ৬টা পেষক (Molar) দাঁতের উপস্থিতি বাকিদের থেকে আলাদা করে রেখেছে এদের। জায়গা বিশেষে এদের গায়ের রঙ হালকা

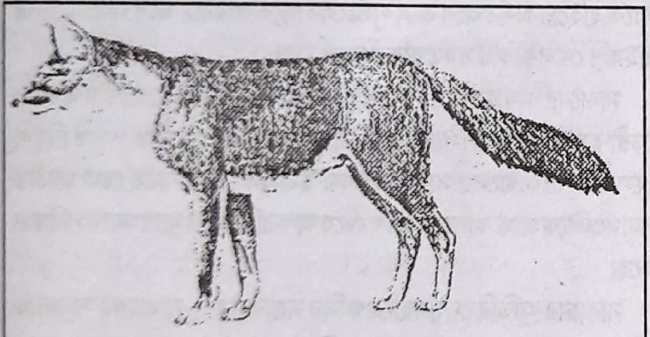

ভারতীয় বুনোকুকুর - Dhole *(Cuon alpinus)*

থেকে গাঢ় হয়। তবে ভারতে এদের অঞ্চলভিত্তিক তিনটে পৃথক জাতি দেখা গেছে যথা -ট্রান্সহিমালয়ান, হিমালয়ান ও পেনিনসুলার।

বিস্তৃতি ঃ— কেন্দ্রীয় ও পূর্ব এশিয়-আলতাই পর্বতমালা থেকে মাঞ্চুরিয়ান প্রদেশ এর বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনাঞ্চলে একদা স্বাভাবিক সংখ্যায় পাওয়া গেলেও ইদানিংকালে এদের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে কমে যাচ্ছে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বিশেষ করে রাজস্থানের রনথম্ভোর জাতীয় উদ্যান, মধ্যপ্রদেশের কানহা, বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান, পান্না বাঘবন ঝাড়খন্ডের বেতলা জাতীয় উদ্যান এবং উড়িষ্যায় সিমলিপাল জাতীয় উদ্যানে এদের তুলনামূলক ভাবে বেশি করে দেখা যায়। লাদাখ ও তিব্বতে এরা মুক্ত মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়।

স্বভাব ও বসতি ঃ— এদের মাথা, দেহ ও লেজ সমেত দৈর্ঘ্য ১৩০ সেমি। উচ্চতায় এরা ৪৫-৫৫ সেমি এবং ওজনে ২০ কেজি হয়। গায়ের রঙ বাদামী। লেজ মোটা ও পুরোটাই কালো।

এরাও সমাজবদ্ধ জীব। এদের সব চাইতে মুখ্য বৈশিষ্ট হল দলবদ্ধ ভাবে শিকার করা। হরিণ, শুয়োর প্রভৃতি এদের প্রিয় খাদ্য। তবে দলবদ্ধ ভাবে ভাল্লুক, বুনো মোষ, গাউর বা বাইসন, এমনকি বাঘকেও মেরে ফেলতে পারে এরা। সত্যি বলতে বনে এরা এমনই এক প্রাণী যাদের বাঘও ভয় পায়। এরা উষ্ণ আবহাওয়া পছন্দ করে। এক একটা দলে একটি পরিবার অথবা একাধিক পরিবারের সদস্যও থাকতে পারে। এক একটা দলে ৫ থেকে ১৫টি সদস্য থাকতে পারে (বস্তুতঃ আফ্রিকার বুনো কুকুরের দলে সদস্য সংখ্যা হয় প্রায় ৩০-৩৫টি)। সংখ্যায় যত বেশী হবে, ততবড় শিকার ধরতে পারে এরা। সাধারণ ভাবে দিনের বেলায় শিকার ধরে। লাদাখ ও তিব্বতে এরা ভেড়া ও অ্যান্টিলোপ্ শিকার করে, কাশ্মীরে মারঘোর, কস্তুরী হরিণ, গোরাল প্রভৃতিকেও শিকার করে এরা। সাধারণভাবে জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী মাসে ৪ থেকে ৬টা বাচ্চা প্রসব করে এরা।

বর্তমান অবস্থা ঃ নগরায়ন ও উন্নয়নের সাথে সাথে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাস স্থল ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে নিরাপদ প্রজনন স্থলের অভাবে, রেবিস ও ডিসটেম্পার প্রভৃতি সংক্রামক রোগের কারণে এবং সর্বপরি মানুষের শিকারের জন্য এরা ভীষণ ভাবে সংকটগ্রস্ত প্রাণী। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ এর তপশীল-২ তালিকাভুক্ত প্রাণী এরা। আফ্রিকাতে পথ দূর্ঘটনাজনিত কারণে এবং হিংস্র সিংহের আক্রমণে (জায়গার অভাবে) এদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন 'অ্যালি প্রভাব' (Allee effect) এর জন্য এদের সম্প্রদায়ের প্রজনন ও বৃদ্ধির হার ব্যাহত হচ্ছে। তবে আশার আলো দেখাচ্ছেন ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বোত্সওয়ানা বন্য কুকুর গবেষণা প্রকল্প (Botswana Wild Dog Research Project)-র বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। একই রকম ভারতীয় বন্য কুকুরের উপরও অনুরূপ সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার, নইলে এই প্রজাতিটিও একদিন পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে।

— লেখক রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব।
মোঃ-৯৪৭৪৪১৭১৭৮

বিজ্ঞান সংবাদ ঃ বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী

২ মে, ২০১৫ কোচবিহার ঃ ৮ম বার্ষিক বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২ মে কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন। জলাভূমির এবং প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে প্রবন্ধ ও প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। প্লাস্টিক দূষণ ও বিকল্প নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর সহ আলোচনা করেন বিজ্ঞানী ডঃ তপন দাস। ডঃ দাস বলেন প্লাস্টিকের বিকল্প প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে। কাগজ, মাটির ভাঁড়, কাচের জিনিস ও পাটের উৎপাদন বাড়াতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের মজা হাতে কলমে করে দেখানো হয়। অনুষ্ঠান প্রধান শিক্ষক আশুতোষ রায়, ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, বিজ্ঞান গবেষক জয়দেব দে বক্তব্য রাখেন।

ইনডের পলিউশন ঃ দূষণের ঘর - ঘরের দূষণ

আধুনিক জীবনযাত্রা ও ইনডোর পলিউশন ঃ আজকাল আমাদের চারপাশে নানা ধরণের জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি, সেই আগেকার দিনের মতো বিশুদ্ধ সেগুন কাঠের খাট, আলমারী, দরজা-জানলা বা মেহগনীর আসবাবের দিন গেছে। বদলে এসেছে স্টিল, প্লাস্টিক, রট আয়রন, সিনটেক্স, ননা রকমারি পদর্থ। এইসব পদার্থগুলোকে আরো বেশি কমনীয়, লোভনীয় করতে এতে আবার মেশানো হয় নানা জৈব যৌগ, (বিশেষ করে পিবিডিই, থালেট এসটার, পিইউ ফোম ইত্যাদি) আর তাতেই খোলে রূপের জেল্লা, পায় আগুন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, ঠিক যেমন রান্নায় স্বাদ, রঙ আনতে নুন-লবন ছাড়াও অনেক সময় তাতে নানারকম অ্যাডেটিভস (যেমন - অ্যাজিনামোটো) যোগ করা হয়, তেমনটাই আর কী!

এইসব অ্যাডেটিভস রাসায়নিক পদার্থগুলোর কাজ আবার এক-এক রকম। কেউ হয়ত শক্তপোক্ত প্লাষ্টিককে নমনীয়, রমনীয় করে তোলে, কেউ বা আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কমায়। আগের মতো তো সারা রাত ভিজিয়ে রাখা কলিচুন দিয়ে নয় - ঘর রঙ করতে আমাদের চাই ওয়েদার কোট, ওয়েদার প্রুফ ইত্যাদি-ইত্যাদি নানা চাহিদা, নানা ইচ্ছা। আর তাই কোন একটি খেলনা বা ঘরের সামগ্রি তৈরি করার সময় কোম্পানিগুলো ইচ্ছাকৃত ভাবেই এইসব অ্যাডেটিভস জাতীয় যৌগগুলো মেশায়, যাতে আমরা আমাদের মনোমত জিনিসটি পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু মুস্কিল হল এই অ্যাডিটিভস হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া রাসায়নিক পদার্থগুলো মোটেই সেই বস্তুটির সঙ্গে আজীবন সখ্যতা বজায় রেখে চলতে পারে না। ফলে, ক্রমে ক্রমে তা ওই বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, মিশে যায় আপনার - আমার ঘরের বাতাসে, পরিবেশ। এইভাবেই তা তৈরি করে ইনডোর পলিউশন, ডেকে আনে নানা রকমের স্বাস্থ্য সমস্যা। শারীরিক, সামাজিক (কখনো কখনো প্রচন্ড গরম, ঠান্ডা বা বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণেও) কারণ ঘরে বেশিক্ষণ সময় কাটান বয়স্ক মানুষ, শিশু ও মহিলারা। তাই এই ধরণের দূষণ জনিত কারণে তাঁদেরই বেশি আশঙ্কা থাকে বিপদের।

ফ্ল্যাট বাড়ির রান্না ঘর ঃ—

ইনডোর পলিউশনের অন্যতম উৎস রান্নাঘর। সেই প্রাক ঐতিহাসিক আমল থেকে আজঅব্দি আগুন জেলে রান্না করা মানেই কাঠ, কয়লা, কেরোসিন অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন, আর তার থেকেই দূষণ। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের বাড়ি (কাঁচা, মাটির বাড়ি) বা সেই বাড়ির রান্না ঘরই শুধু নয়, বিপদ আসতে পারে আজকের একেবারে ঝাঁ চকচকে আধুনিক ফ্ল্যাটের রান্নাঘর থেকেও! অবাক হবেন না। বিজ্ঞানীরা বলছেন আধুনিক ফ্ল্যাট বাড়ির রান্না ঘর থেকে যে পরিমান দূষণ ছড়ায় তা রাস্তার দূষণ থেকে কোন অংশেই কম নয়।

বাড়ির ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনার ঃ—

আজকাল ফ্রিজ তো ঘরে ঘরে। এমনকি অনেকেরই ঘরে রয়েছে এসিও! বিশেষ করে শহরের আধুনিক ফ্ল্যাটগুলোতে বসবাসকারী লোকজনদের কাছে এই দুটি জিনিস এখন অত্যাবশকায় পন্য। ঘরের দূষণের জন্য দায়ী আমাদেরই ঘরে থাকা এইসব অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। প্রতিদিন নিয়মিত সিএফসি, মিথেন, কার্বনডাইঅক্সাইড, কার্বনমনোঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন গ্যাস সহ আরো তিন ধরণের ফ্লুরিনেটেড গ্যাস - সালফার হেক্সাকোরাইড, হাইড্রোফ্লুরোকার্বন, পারফ্লুরোকার্বন ঘরের বাতাসে মিশছে বাড়ির ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনার থেকে, যা ডেকে আনছে ইনডোর পলিউশন।

ইনটরিয়ার ডেকোরেশন বা রেনোভেশন ঃ—

আরে বাহ! আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ঘরগুলো খুব সুন্দর, কি দারুন সাজানো! দাড়ান দাড়ান - আনন্দ করবেন পরে, আগে দেখুন তো ঘরের নানা ফার্ণিচার থেকে শুরু করে দরজা-জানলা, এমনকি বাড়ির সমস্ত ইলেকটিক্স গ্যাজেট গুলো কতটা আপনাকে আর আপনার বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দিচ্ছে কী? তাকিয়ে দেখুন বেশির ভাগ জিনিসপত্রেই পলিমার/প্লাস্টিকের ছড়াছড়ি। আর প্লাস্টিক মানেই পিভিসি, পিবিডিই, পলিইউরেথেন ফোম, থালেট, উদ্বায়ী জৈব পদার্থ যেমন অ্যালডিহাইড প্রভৃতি নানা ক্ষতিকারক রাসায়নিকে ভরা। আপনার পার্সোন্যাল কেয়ার প্রোডাক্ট, কসমেটিক্স প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে মেঝের ম্যাট্রেস, এমনকি বাচ্চাদের খেলনাগুলোও তাই।

লেখক ঃ ডঃ সোমা বসু, মোঃ-৯৪৩৩৯৪১৭৭৬
Email : bsoma25@rediffmail.com

কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের ৮ম বার্ষিক সম্মেলন

সংবাদ ঃ ১ মে, কোচবিহার বাদুরবাগান নিজস্ব কার্য্যালয়ে কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের ৮ম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ সচেতনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রচার কর্মসূচী নিয়ে সম্পাদক শংকর নারায়ন দাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে বিমল বশাক বলেন প্রতি মাসে সংস্থার কার্য্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করা হবে। সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের পরিবেশ ভারসাম্য যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তাতে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে জানালেন সংস্থার সভাপতি ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার পক্ষে জয়দেব দে যখন পৃথিবী বিপন্ন শীর্ষক বইটি আলোচনা করেন।

ভূমিকম্প ও তার থেকে বাঁচতে

৪ পাতার পর

● বহুতল, ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ভূমিকম্পের সময় নীচে নামতে কী ব্যবহার করবেন — সিঁড়ি না লিফট ঃ— অবশ্যই সিঁড়ি। কারণ ভূমিকম্পের সময় লিফট ব্যবহার করা অনুচিত। ভূমিকম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ বাধা পায়। ফলে মাঝপথে লিফটের মধ্যে আটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

● ভূমিকম্পের সময় টেলিফোন ব্যবহার করা যায় কি ঃ— না করাই ভালো। টেলিফোনের খুঁটি উপড়ে কিংবা তার ছিঁড়ে বিপদ হতে পারে।

● যে সব জিনিস ভূমিকম্পের সময় কাছে রখতে হয় ঃ— ১) মোটা মোটা কয়েকটা বালিশ (প্রয়োজনে মাথার উপর দেওয়ার জন্য)। ২) ব্যাটারি চালিত রেডিও (ভূমিকম্পে অন্যান্য সব যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে)।

ভূমিকম্প ও তা থেকে বাঁচতে করণীয়

(ভারতের ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের নানান দিক নিয়ে জানিয়েছেন। তথ্য সূত্র ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২২/০৯/২০১১)

• ভূমিকম্পের কারণ ঃ— বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি হয় ভূপৃষ্ঠ। যেন এক একটা প্লেট। এই প্লেটগুলি স্থান পরিবর্তন করে। বলা হয় 'টেকটোনিক' মুভমেন্ট। অবশ্যই ধীরগতিতে। বিস্তৃতাতেও দুটি প্লেটের সংঘর্ষের ফলে চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপ ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। চাপ যত বাড়ে ভূমিকম্পের তীব্রতাও তত বৃদ্ধি পায়।

• ভূমিকম্পপ্রবণ স্থান ঃ— ভূপৃষ্ঠের পাথর বসে গেলে ফাটল ধরে। তবেই সেটা এগোয়। যে যে স্থানে এই সম্ভাবনা থাকে সেই সব এলাকা ভূমিকম্পণপ্রবণ স্থান বলে চিহ্নিত হয়। এই সম্ভাবনা সব জায়গায় থাকে না। তাই সে সব জায়গায় ভূমিকম্প হয়ও না।

• ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষ তর কারণ ঃ— প্লেটের সংঘর্ষে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা সিসমিক তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে। তিন ধরণের তরঙ্গ চিহ্নিত হয়েছে। 'পি', 'এস' এবং 'এল'। পি-তরঙ্গ ধাক্কা মারে উপর নীচ দিকে। এস-তরঙ্গ ততটা ক্ষতিকারক নয়। আবার এল তরঙ্গ অত্যন্ত ভয়ানক। সব কিছু গুঁড়িয়ে দেয় তাই ভূমিকম্পে এত ক্ষয়ক্ষতি হয়, জীবনহানি ঘটে।

• ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যায় না ঃ— এ ব্যাপারটা এখনও অবধি পরীক্ষাধীন। অনেকে পশুপাখির আচরণের সঙ্গে ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের একটা সম্বন্ধ টানতে চেষ্টা করেন। তবে এই সবই এখনও গবেষণার স্তরে। আসলে ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিতে বাতাসে 'রেডন' মাপা জরুরি। এই সুযোগ বর্তমানে নেই।

• প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সঙ্গে ভূমিকম্পের কারণ জড়িত নয় ঃ— ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহার কিংবা ভূপৃষ্ঠ থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, আহরণ-এ সবের সঙ্গে ভূমিকম্পের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

• ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ভূমিকম্পের সঙ্গে সম্পর্কিত হতেও পারে ঃ— পারমাণবিক বিস্ফোরণে প্রচন্ড তাপ ও চাপের সৃষ্টি হয় যা ভূগর্ভস্থ পাথরে ফাটল ধরাতে সহায়ক। এতে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়ে।

• পাহাড়ি এলাকায় বহুতল বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে ভূমিকম্পের কোনো সম্পর্ক নেই ঃ— এই সম্পর্ক থাকলে জাপানে আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি হত না। জাপান ও ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ বলে চিহ্নিত।

• ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাড়ি ঘর তৈরি সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা প্রয়োজন ঃ— ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাড়ি ঘর তৈরির সময় ভূমিকম্প নিরোধক প্রযুক্তি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পায়।

• ভূমিকম্পের সময় ঘরের মধ্যে থাকুন ঃ— ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি যতক্ষণ না বন্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ ঘরের মধ্যেই থাকুন। বেশির ভাগ লোকের ধারণা, ভূমিকম্পের সময় ঘরের মধ্যে থাকলে ঘর চাপা পড়ে মরার সম্ভাবনা প্রবল। ধারণাটা ঠিক নয়। সমীক্ষায় প্রকাশ, তাড়াহুড়ো করে বাইরে বের হওয়ার সময় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে শরীরে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বাইরে বের হলে গাছ উপড়ে, লাইটপোষ্ট পড়ে, দেওয়াল চাপায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তথ্য মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হয়।

• দেয়াল জানালার পাশে দাঁড়াবেন না ঃ— ভূমিকম্পের সময় দেয়াল জানালা সজোরে চূর্ণ হতে পারে। এতে শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

• ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত স্থান বেছে নিন ঃ— খাট কিংবা টেবিলের নীচে অপেক্ষা করা যেতে পারে। এগুলি সুরক্ষিত স্থান। মাথায় মোটা বালিশ চাপা দেওয়া জরুরি। নয়ত ঘরের যে দেয়ালে জানালা নেই তার পাশ বরাবর। লক্ষ্য রাখতে হবে, বুক শেলফ আলমারির মতন ভারী জিনিস যেন সামনে না থাকে কারণ এগুলিতে জখম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

• ভূমিকম্প শেষ হলে ঘর থেকে বের হোন ঃ— ভূমিকম্প শেষ হওয়ার অন্তত পাঁচ মিনিট পরে ঘর থেকে বাইরে যান।

• ভূমিকম্পের সময় বাড়ির বাইরে থাকলে কী করবেন ঃ— বহুতল বাড়ি, গাছ, ইলেকট্রিকের পোষ্ট থেকে দূরে থাকুন। ভূমিকম্পে এ সব উপরে যেতে পারে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় মাথায় কিছু চাপা দিয়ে অপেক্ষা করুন।

• ভূমিকম্পের সময় গাড়িতে থাকলে কী করণীয় ঃ— ফাঁকা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, সিটবেল্টভালো করে লাগানো দরকার। ব্রিজ, কালভার্ট, উড়ালপুলের উপর গাড়ি দাঁড় করানো ঠিক নয়, কারণ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভূমিকম্প শেষ হবার পরও এগুলির উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবার সময় সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

• ভূমিকম্পের সময় পাহাড়ি অঞ্চলে থাকলে করণীয় কী ঃ— ভূমিকম্পে পাহাড়ি অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই পাহাড়ে ধস নামে। ধস নামার ব্যাপারে তাই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

• ভূমিকম্পের সময় সমুদ্রে স্নানরত কিংবা সমুদ্রতটে থাকলে কী করা প্রয়োজন ঃ— সমুদ্র তীর থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রখতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন ভূমিকম্প সুনামি তৈরি করে আর সুনামির তাণ্ডলীলা সম্পর্কে আমরা তো সবাই কম বেশি অবগত।

এরপর 7 পাতায়

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com